জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০

বড় শরীফপুর মসজিদ: মুঘল যুগের এক অন্যতম নিদর্শন

মো. শাহ আলম*

Abstract

In the Medieval period, many elite persons like kings, the religious rulers, provincial rulers, governors build many architectural monuments. The Mosques, Temples, Buildings, Bihar etc. are the architectural monuments build by them. 'Boro Sharifpur Mosque' which is situated at Laksam in Cumilla is such an architectural monument. This mosque represents the Muslim architecture of Mughal period. This article interprets how this mosque plays an important role to restrain the history and tradition of Mughal architecture of Medieval Period.

ভূমিকা

কুমিল্লা জেলা বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ একটি অন্যতম জেলা। এখানে প্রাচীন কালের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার নিদর্শন পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের মসজিদ, মাদ্রাসা, প্রাসাদ, সরাইখানা ও জমিদার বাড়ি; বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন মন্দির, ঘাট ও বিভিন্ন ঢিবি; হিন্দু দের বিভিন্ন মন্দির ও উপাসনালয়। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সমকালীন স্থাপত্য। কোন একটি অঞ্চলের স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের রুচিবোধ, তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি ঐ অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠী এবং প্রশাসন ও তাদের চরিত্র সর্ম্পকেও খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নগরায়ণের ধারা এবং তার সূত্র ধরে প্রশাসনের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিও অনুভব করা যায়। আধুনিক ইতিহাস কেবল রাজ্য ও রাজাদের কাহিনিই নয়, এখন ইতিহাসকে বিবেচনা করা হয় কালের দর্পণ হিসেবে যেখানে প্রতিফলিত হয় সমকালের মানব সভ্যতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এখানে রাজাদের রাজ্যপাট, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়ের চিত্র যেমন থাকে, তেমনি থাকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি, তাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপনের চিত্র। সেই চিত্র স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে খুব চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জলবায়ু, নির্মাণ উপকরণের প্রাপ্যতা, জনগণের অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রভাবে গড়ে ওঠে ঐ অঞ্চলের স্থাপত্যের নিজস্ব চরিত্র এবং তার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের স্থাপত্যের মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সে কারণেই আঞ্চলিক স্থাপত্যের ইতিহাস অন্বেষণ ইতিহাস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে বাংলাদেশের আঞ্চলিক স্থাপত্যের ইতিহাস চর্চা এখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থাপত্যের ইতিহাস চর্চা তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বাংলার মধ্যযুগের স্থাপত্য সম্পর্কেই গবেষণা হয়েছে খুব সামান্য। কুমিল্লা জেলার বড় শরীফপুর মসজিদ মুঘল যুগে নির্মিত তেমনি একটি আঞ্চলিক স্থাপত্য। এই প্রবন্ধে কুমিল্লা জেলার আঞ্চলিক স্থাপত্য হিসেবে গড়ে ওঠা বড় শরীফপুর মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব এবং সেই সাথে বর্তমান জীবনে স্থাপত্যের প্রভাব ও পর্যটনভাবনা স্থান পেয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

"বড় শরীফপুর মসজিদ: মুঘল যুগে নির্মিত এক অন্যতম নিদর্শন" এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তা হলো– মাঠ-জরিপ ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি। প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণের

---

*এম.ফিল গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জন্য প্রায় সকল উপকরণ মাঠ-জরিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাদি যথাযথ পরিদর্শন, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ গ্রহণ, আলোকচিত্র ধারণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। এসব তথ্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা কর্মের তথ্য–উপাত্তগুলো মাঠ জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্যের আলোকে মাঠকর্মের তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাইপূর্বক যৌক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনাও এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। উভয় পদ্ধতিতে আহরিত তথ্যাদির যথার্থ প্রয়োগ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসে বর্তমান প্রবন্ধের রচনা কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে S.J Kundosn (1999) এর *Culture in Retrosprot* এবং Peter L. Drawelt (1999) এর *Field Archaeology and Introduction* গ্রন্থ দুটির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কুমিল্লা জেলার মুঘল আমলে নির্মিত প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে বড় শরীফপুর মসজিদটি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কুমিলা অঞ্চলের মুঘল আমলের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে সেই সময়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করা। সামগ্রিকভাবে এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো নিচে প্রদান করা হলো-

- প্রত্নস্থলের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানা।
- প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে প্রত্নস্থল ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর আকার, আকৃতি, সীমারেখা ইত্যাদি নির্ণয় করা।
- প্রত্নতত্ত্বের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করে ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
- প্রত্নস্থলের পরিচিতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা।
- প্রত্নবস্তুর সময়কাল র্নিণয় করা।
- প্রত্নস্থানের আশেপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে জরিপের মাধ্যমে জানা।
- ভূ-প্রাকৃতিক ও বর্তমান ইকোলজিক্যাল বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করা।
- প্রত্নক্ষেত্রের ভূমির বিন্যাস ও ভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা।
- সর্বোপরি প্রত্নস্থানের সার্বিক তথ্য জানার জন্য গবেষণা কার্য পরিচালনা করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে কুমিল্লা জেলায় মুঘল যুগে নির্মিত বড় শরীফপুর মসজিদটি একটি প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে গুরুত্ব পাবে এবং এই স্থাপত্যটিকে কেন্দ্র করে মুঘল আমলের ইতিহাস পুনর্গঠন সম্পর্কিত আরও নতুন তথ্য সংযোজিত হবে। গবেষক, সাধারণ পাঠক ও সুধিজন কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পর্যটনকেন্দ্র সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানার ও দেখার সুযোগ পাবে। পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও প্রচারে এই স্থাপত্যটি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে আরও উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়। যেকোনো জাতির পরিচয় জানতে বিবেকের অনুপ্রেরণা ও আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই ইতিহাসের শিকড় অনুসন্ধান করা জরুরি। চলমান সমাজের দর্পণ, সংবাদপত্র, ছবি, দলিল ও নথিপত্র ইতিহাসের সাক্ষী। কোনো স্থানের শিল্পকর্ম বিষয়ে বিশেষ করে শিল্পকর্মের বিভিন্ন লিখিত, অলিখিত, অঙ্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করে ঐ শিল্পকর্মের সঠিক ইতিহাস জানা যায়। আমাদের পর্যটনশিল্পের নীতি নির্ধারণেও আলোচনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং প্রবন্ধটির যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সংশ্লিষ্ট রচনাবলি পর্যালোচনা

কুমিল্লা জেলা প্রত্নসম্পদসমৃদ্ধ একটি জেলা। এই জেলায় প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসনকাল পর্যন্ত বহু প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু গবেষণা গ্রন্থ ও সাহিত্য রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- আয়শা বেগম রচিত *প্রত্ননিদর্শন: কুমিল্লা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১০), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা: বাংলাবাজার, ২০০৭), মাহ্মুদা খানম রচিত *কুমিল্লায় মুঘল যুগের স্থাপত্য* (ঠাকুরগাঁও, ২০১২), এম. এ. বারি কর্তৃক “Mughal Mosque Type of Bengal: Origin and Development” শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভ (ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০), আহমেদ হাসান দানি-এর প্রকাশিত গ্রন্থ “Muslim Architecture in Bengal” (ঢাকা, ১৯৬১) প্রভৃতি। উল্লেখিত গ্রন্থ ও প্রকাশিত গবেষণা পত্রে বড় শরীফপুর মসজিদ সম্পর্কে তেমন কোন বিশদ আলোচনা হয়নি। বিশেষ করে মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব, স্থানীয় উপকরণের প্রভাব, আলঙ্কারিক রীতি এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এই প্রবন্ধে কুমিল্লা জেলার বড় শরীফপুর মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব, স্থানীয় উপকরণের প্রভাব, আলঙ্কারিক রীতি এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বড় শরীফপুর মসজিদের অবস্থান

কুমিল্লা জেলার ৯০ ডিগ্রি ৩১ মিনিট থেকে ৯১ ডিগ্রি ২২ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৩ ডিগ্রি ১২ মিনিট থেকে ২৪ ডিগ্রি ১৬ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। ৯০ ডিগ্রি পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত।[১] কর্কটক্রান্তি রেখা কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে অতিক্রম করায় এ জেলা সর্বতোভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। কুমিল্লা জেলার অবস্থান পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে।[২] চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে কুমিল্লা জেলার অবস্থান গোমতী নদীর তীরে এবং লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে। এর আয়তন ৩০৮৫.১৭ বর্গ কি.মি। এই জেলার উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, উত্তর-পশ্চিমে নারায়নগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ফেনী জেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলা অবস্থিত।

বড় শরীফপুর মসজিদটি কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার বাইশগাঁও ইউনিয়নের বড় শরীফপুর গ্রামে নাটেশ্বর দীঘি[৩] নামে পরিচিত একটি বিশাল দীঘির পূর্ব তীরে অবস্থিত। লাকসাম থানা সদর থেকে প্রায় ২৭ কি. মি. দুরে অবস্থিত চিতসী বাজারের নিকটে এই প্রত্যন্ত গ্রামটির অবস্থান। মসজিদটি বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত।[৪] এই স্থানটি পরিদর্শনের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। কুমিল্লা থেকে সরাসরি সড়কপথে ও রেলপথে এই প্রাচীন প্রত্নস্থলটির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

মসজিদের নির্মাণ-উপকরণ

প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল এলাকা বিস্তৃত নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি হলো প্রাচীন বাংলা। এই বাংলার সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত হলো কুমিল্লা জেলা। বাংলার মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই ঘর-বাড়ি নির্মাণে পোড়ামাটির ফলক, রোদে শুকানো ইট, কাঠ, চুন-সুরকি ব্যবহার করে আসছে। সহজলভ্যতার কারণে স্থানীয়রা এই সকল উপকরণ ব্যবহার করত। এই অঞ্চলে পাথরের খনি না থাকায় পাথরের ব্যবহার তেমন হয়নি বললেই চলে। মধ্য যুগে বাংলায় বহু মুঘল স্থাপত্য নির্মিত হয়। এই সকল স্থাপনায়ও স্থানীয় উপকরণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আঠার শতকের শুরুতে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত লাকসাম উপজেলায় নির্মিত হয় বড় শরীফপুর মসজিদ, যার নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এসব স্থানীয়

উপকরণ। স্থানীয় উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে আগুনে পোড়ানো ইট, পলেস্তরার জন্য ধূসর বেলে মাটি, স্থানীয় কাঠ, লোহা, চুন-সুরকি প্রভৃতি।

মসজিদের নির্মাতা, নির্মাণকাল ও নামকরণ

বড় শরীফপুর মসজিদে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপর একটি শিলালিপি[৫] ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে একটি শিলালিপি[৬] রয়েছে। ফারসি ভাষায় ছন্দবদ্ধ কবিতায় ও নাস্তালিক রীতিতে কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে মসজিদটির নির্মাণকাল ১১১৮ হিজরি (১৭০৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ)।[৭] কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরের শিলালিপি অনুসারে মসজিদটির নির্মাণকাল ১১০২ হিজরি (১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ)। শিলালিপি অনুসারে এর নির্মাতা মুহাম্মাদ হায়াত আবদ করিম। কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ১৯৭৭ খ্রি. এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ হায়াত আবদ করিম জনৈক কোতওয়াল ছিলেন, তিনি এটি নির্মাণ করেন বলে মসজিদটিকে কোতওয়ালী মসজিদও বলা হয়।[৮] স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, শাহ সৈয়দ বাগদাদী নামক একজন দরবেশ এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন। তারই শিষ্য আব্দুল করিম ১০৬৮ হিজরি (১৬৫৭-৫৮) সনে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সুলতান শাহ্ শুজার সুবাদারি কালে।[৯] বর্তমানে এই মসজিদটি গ্রামের নামানুসারেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত বলে একে বড় শরীফপুর মসজিদ নামে ডাকা হয়। সুলতানুল আউলিয়া সৈয়েদুস সাদাত হযরত সৈয়দ পীর শাহ শরীফ বাগদাদী (রহ.) নামে এক দরবেশ এই গ্রামে আসেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তিনি আমৃত্যু এই গ্রামে বাস করেন। তার মাজার বড় শরীফপুর মসজিদের ৬০০ মিটার দক্ষিণে নাটেশ্বর দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। এই দরবেশ এর নামানুসারেই এই গ্রামের নামকরণ করা হয় শরীফপুর গ্রাম।

মসজিদের ভূমি নকশা ও গঠন

মসজিদের পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রবেশ তোরণ পেরিয়ে নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। মসজিদের চারকোণে চারটি বিশাল অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মূল মসজিদটির পরিমাপ বাইরের দিক থেকে ১৪.৪৮ মি. ৫.৯৪ মিটার (ভূমি পরিকল্পনা ১)।

অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজগুলো ছাদ ছাড়িয়ে উর্ধ্বগামী। এগুলোর মধ্যে সামনের দুটির শীর্ষে রয়েছে পদ্মকলস নকশার ফিনিয়াল শোভিত ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ। তবে পেছনের দুটির শীর্ষে রয়েছে ত্রিকোনাকৃতির চূড়া। বুরুজগুলোতে কয়েক স্তরে ব্যান্ডের নকশার ব্যবহার করা হয়েছে যা বাংলার স্থানীয় উপকরণ বাঁশের গিটের ন্যায়। এছাড়াও এর শীর্ষে রয়েছে পদ্মফুল ও কলস সম্বলিত শীর্ষদণ্ড। এটিতেও বাংলার স্থানীয় উপকরণের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদের কিবলা কৌঠায় প্রবেশের জন্য মোট ৫টি খিলান আকৃতির প্রবেশপথ রয়েছে যার মধ্যে পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথ ২টি বর্তমানে লোহার তৈরী জালি নকশা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পূর্ব দিকের প্রবেশপথগুলো অর্ধগম্বুজ আচ্ছাদিত ভল্টের নিচে উন্মুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং এটি দেয়াল থেকে বহির্গত একটি প্রক্ষেপণের মধ্যে স্থাপিত। এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে রয়েছে অষ্টকোনাকার দুটি আলঙ্ককারিক সরু মিনার বা বুরুজ। যার শীর্ষে রয়েছে কলস সম্বলিত শীর্ষদণ্ড। বহির্দেয়ালে আয়তাকার খোপ নকশা পরিলক্ষিত হয়। প্রধান প্রবেশপথের উভয় পাশে আয়তাকার প্যানেলের পাশে ৫টি করে আয়তাকার খোপ-নকশা যার মধ্যে ২টি গভীর, আর এই ২টি খোপ-নকশা আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হতো। উপরে ৩টি আয়তাকার খোপএর মাঝেরটিতে একটি ফারসি শিলালিপি রয়েছে। অন্য প্রবেশপথগুলো আয়তাকার ফ্রেমে সংস্থাপিত এবং অর্ধ গম্বুজের মাধ্যমে সৃষ্ট।[১০]

বড় শরীফপুর মসজিদে ৩টি গম্বুজ রয়েছে। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অন্য দুটি গম্বুজ থেকে অপেক্ষাকৃত বড় যা মুঘল যুগের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। তিনটি গম্বুজ অষ্টকোনাকার ড্রাম বা পিপার উপরে স্থাপিত। গম্বুজগুলোর শীর্ষে রয়েছে পদ্মফুলের নকশা ও কলসচূড়াশোভিত ফিনিয়েল যা গ্রাম বাংলার বৈশিষ্ট্য বহন করে। গম্বুজের নিচের অংশে রয়েছে পদ্ম-পাপড়ির বন্ধ মারলন নকশা।[১১] কেন্দ্রীয় গম্বুজের ভেতরের অংশে ৪০টি এবং ছোট দুটিতে ৩২টি করে খোপ-নকশা রয়েছে। প্রতিটি গম্বুজের নিচে চার কোনায় ৪টি ফুলের টবের নকশা করা রয়েছে।

পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে ৩টি অষ্টকোনাকার অর্ধ গম্বুজবিশিষ্ট মিহরাব রয়েছে এবং মিহরাবগুলো আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের ফ্রেমে রয়েছে পদ্ম-পাপড়ির বন্ধ মারলন নকশা। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে একটি ফারসি শিলালিপি রয়েছে। প্রতিসাম্য বজায় রাখার জন্য এখানেও কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অন্য দুটি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং কিছুটা বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে ৭টি খোপ-নকশা ও ২টি অর্ধ খোপ-নকশা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডান পাশে তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বর রয়েছে যেখান থেকে ইমাম খুৎবা পাঠ ও মুসলিম জাহানের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের ডান পাশে একটি, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি এবং পূর্ব দেয়ালে প্রধান প্রবেশপথের দুই পাশে দুটি গভীর খোপ-নকশা রয়েছে যেগুলো আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হতো।

দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন ইটের তৈরী স্তম্ভের উপর থেকে আড়াআড়ি ভাবে নির্মিত দুটি প্রশস্ত খিলান মসজিদের অভ্যন্তরভাগকে তিনটি বে (Bay)-তে বিভক্ত করেছে। এর মধ্যবর্তী বে-টি বর্গাকার এবং দুপাশের দুটি আয়তাকার। তিনটি বে-এর উপরেই আচ্ছাদন হিসেবে রয়েছে সামান্য কন্দাকৃতির গম্বুজ।[১২] গম্বুজগুলোর ভার বহনের জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে লালবাগ দুর্গের মসজিদ[১৩] এবং ঢাকার সাত গম্বুজ মসজিদ[১৪] এর মত পেন্ডেনটিভ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ত্রিভুজাকৃতির খিলান দিয়ে ৩টি বে-এর সমন্বয়ে এক আইল বিশিষ্ট নামাজঘর রয়েছে।

মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের অংশে মিহরাবের উপর আয়তাকার প্যানেল রয়েছে যার দুপাশে দুটি অষ্টাভূজাকৃতির বুরুজ রয়েছে এবং বুরুজগুলোর মাঝে ছোট ৩টি আয়তাকার প্যানেল নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনের দেয়াল কিছুটা বাহিরের দিকে প্রক্ষিপ্ত এবং মসজিদের বপ্র (Parapet) এর সমান্তরাল। মসজিদের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তর রয়েছে যার পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট এবং উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে ১০.৫ ফুট বিশিষ্ট খোলা জায়গা রয়েছে।

মসজিদের অলঙ্করণ

মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালটি খিলানকৃত গভীর খোপ-নকশার সাহায্যে চমৎকারভাবে অলংকৃত। সমান্তরাল বপ্র এবং তার উপরে গম্বুজের নিম্নাংশের অষ্টকোনাকার ড্রাম পদ্ম-পাপড়ি নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত। ছাঁচে ঢালা ব্যান্ড নকশার সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত অষ্টকোনাকার পার্শ্ব বুরুজসমূহের ভিত্তিতে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন কলস নকশা ও ডালিম ফলের সমন্বয়ে শীর্ষদণ্ড। মিহরাব ও খিলানগুলোর বাইরের দিক বহু খাঁজ বিশিষ্ট।[১৫] মসজিদের বাহিরে উপরের অংশে ছাদ বরাবর চার পার্শ্বে রয়েছে বন্ধ মারলন নকশা এবং কয়েক স্তরবিশিষ্ট বন্ধনী নকশার ব্যবহার করা হয়েছে যা মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মসজিদের অভ্যন্তর অংশ বর্তমানে পলেস্তরা আচ্ছাদিত এবং চুনকাম করা। কেন্দ্রীয় মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের উপরে রয়েছে বদ্ধ পদ্ম-পাপড়ির নকশার একটি সারি। মিহরাবের অভ্যন্তরে রয়েছে পদ্ম নকশা। এগুলো মসজিদের শোভা বর্ধন করে মসজিদের স্থাপত্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

গম্বুজের অভ্যন্তরের নিম্নাংশ ঘিরে রয়েছে পদ্ম পাতার মারলন নকশা এবং তার উপরে রয়েছে বৃহদাকার চক্র নকশা। মসজিদের যে ৩ টি বে (Bay) রয়েছে, প্রতিটি বে-এর চারকোনায় চারটি ফুলদানি নকশা

আঁকা। মসজিদের খিলানগুলো মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। গম্বুজগুলো অর্ধ খিলানের সাহায্যে পেন্ডেনটিভ পদ্ধতিতে পূর্ণ করে একটি আকর্ষণীয় স্থাপত্যের রূপ দান করেছে।

মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজের উপরের অংশে পর্যায়ক্রমে ছত্রী, কলস, মিষ্টি কুমড়া, পুনরায় কলস ও শীর্ষদণ্ড যা আলঙ্কারিক রীতির এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ছোট দুটি গম্বুজের উপরের অংশে পর্যায়ক্রমে রয়েছে ছত্রী, দুটি কলস ও শীর্ষদণ্ড। মসজিদের ছাদের উপরে গম্বুজের নিচের অংশে রয়েছে পদ্ম-পাঁপড়ির বদ্ধ মারলন নকশা যা মসজিদটিকে নতুন রূপ দান করেছে।

মসজিদের পরবর্তী সংস্কার

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটিকে সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে এর কিছুটা সংস্কার করা হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদটির আর সংস্কার করা হয়। অলংকৃত খোপ-নকশা সমূহের আদিরূপ ফিরিয়ে আনার জন্য এ সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কুমিল্লা জেলার বড় শরীফপুর মসজিদটি কিভাবে কুমিল্লা জেলার মুঘল যুগের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং কিভাবে এটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সম্প্রসারিত ও বিকাশিত হচ্ছে শুধুমাত্র সেই বিষয়টি এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। অন্যথায় এর কলেবর অনেক বেড়ে যেত। কুমিল্লা জেলার প্রত্নস্থল এর মধ্যে বড় শরীফপুর এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরও অনেক প্রত্নস্থল রয়েছে যা নিয়ে পর্যটক, পাঠক ও গবেষকদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। অধিকতর নিবিড় মাঠ-জরিপ, পর্যবেক্ষণ ও পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তথ্য আহরণ করতে পারলে সেই আঙ্গিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণ সম্ভব।

মন্তব্য

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত লাকসাম উপজেলার বড় শরীফপুর গ্রাম একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। সেখানে গড়ে ওঠা বড় শরীফপুর মসজিদটি তৎকালীন মুঘল আমলের ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মসজিদটির একটি বড় গম্বুজ ও তার দুই পাশে দুটি ছোট গম্বুজ বিশিষ্ট পরিকল্পনা, মসজিদের বুরুজগুলো বা মিনারগুলো মসজিদের ছাদের কার্নিশ থেকে সামান্য উঁচুতে এবং শীর্ষে কলস ও ডালিমের সমন্বয়ে শীর্ষদণ্ড, কার্নিশ ও বুরুজে বন্ধনীর ব্যবহার, গম্বুজ নির্মাণে পেন্ডেনটিভ পদ্ধতি অনুসরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই মসজিদটি মুঘলবাংলার মসজিদ স্থাপত্যের অতি পরিচিত রূপটিই তুলে ধরেছে। এছাড়া এই মসজিদে কিছু স্থানীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন: এই মসজিদে বুরুজ নির্মাণে বন্ধনীর ব্যবহার স্থানীয় উপাদান বাঁশ গাছের গিটকে অনুসরণ করে নির্মিত। মসজিদের ছাদ নির্মাণেও ব্যবহার করা হয় দেশীয় রীতি। ছাদের মাঝে উঁচু এবং দুই পাশে কিছুটা ঢালু করে নির্মিত ও তিন স্তর বিশিষ্ট কার্নিশের ব্যবহার যা গ্রাম-বাংলার কুঁড়েঘরের অনুরূপ করে নির্মিত। এছাড়াও গম্বুজের উপরে ও বুরুজের উপরে যে কলস সমৃদ্ধ শীর্ষদণ্ড রয়েছে তাও গ্রাম-বাংলায় ব্যবহৃত কলসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মসজিদের বুরুজের শীর্ষে ব্যবহৃত ডালিম ফলের ব্যবহার ঘরে ঘরে উৎপাদিত ফলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গম্বুজের শীর্ষে ব্যবহৃত মিষ্টি কুমড়া গ্রামে উৎপাদিত ফসলের প্রভাব লক্ষ করা যায়। রোদ কিংবা বৃষ্টিতে ব্যবহৃত নিত্য দিনের সঙ্গী হিসেবে পরিচিত ছাতা এই মসজিদের গম্বুজের উপরে ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্মপাতা ও পদ্মফুল বাংলার সকল অঞ্চলে উৎপাদিত হয় যার প্রভাব এই মসজিদের গম্বুজের শীর্ষে ও মিহরাবের উপরে লক্ষ করা যায়। উল্লেখিত উপাদানগুলোর ব্যবহার যেমন এই অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয় তেমনি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিচয় মেলে এসবের মাধ্যমে। তাছাড়া আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রান্তিক অঞ্চলের সাথে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক

বা অন্যান্য ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের নিবিড় সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ছিল। মধ্যযুগে নির্মিত এই মসজিদটি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয় এবং একই সাথে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতিকেও তুলে ধরে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বড় শরীফপুর মসজিদে গ্রাম-বাংলার উপদানের ব্যবহার, স্থানীয় প্রভাব, নির্মাণ পদ্ধতি ইত্যাদি মধ্যযুগের মুঘল স্থাপত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে গবেষকদের জন্য, পঠন-পাঠনের জন্য এবং পর্যটকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হবে এই বড় শরীফপুর গ্রাম। সেই সাথে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যৌথ পর্যালোচনায় এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটবে। বড় শরীফপুর মসজিদটি ষোড়শ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তার ইতিহাস-ঐতিহ্য ধারণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। অদূর ভবিষ্যতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করবে কুমিল্লার প্রত্যন্ত গ্রামের এই স্থাপত্যটি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-কুমিল্লা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মার্চ ২০১৪), পৃ. ২৪

২. আবুল কাসেম, *কুমিল্লার ইতিহাস, আদি পর্ব* (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনি, বাংলাবাজার, ২০০৮), পৃ. ২১

৩. **নাটেশ্বর দীঘি:** সুলতানুল আউলিয়া সৈয়েদুস সাদাত হযরত সৈয়দ পীর শাহ শরীফ বাগদাদী (রহ:) নামে এক দরবেশ এই গ্রামে আসেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তিনি আমৃত্যু এই গ্রামে বাস করেন। তার মাজার অবস্থিত বড় শরীফপুর মসজিদের ৬০০ মিটার দক্ষিণে নাটেশ্বর দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব পাড়ে। এই দরবেশ এর নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ করা হয় শরীফপুর গ্রাম। শরীফপুর গ্রামে এক হিন্দু রাজপরিবার বাস করতেন বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই পরিবারের নাটেশ্বর নামে এক রাজা ১৯৬৭ সালে ২৭.২৪ একর আয়তন বিশিষ্ট বিশাল একটি দীঘি খনন করেন। তার নাম অনুসারে এই দীঘির নাম রাখা হয় নাটেশ্বর দীঘি।

৪. বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা, *বিজ্ঞপ্তি নং এফ ৪.৩(২)/৪৫-এফ এন্ড এল, তারিখ: ০৭-০৭-১৯৪৫*

৫. শিলালিপি: বড় শরীফপুর মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের শীর্ষে স্থাপিত শিলালিপি: ফারসি ভাষা

. يا عليے بسم الله الرحمن الرحيم يا عليے
. از محمد حيات عبد كريم مسجدى شربنا چو كعبہ مقيم
. سال تاريخ فرحش ہاتف گفت ظاهربوذ زنام عظيم

১ম: ইয়া আলী। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইয়া আলী। অর্থ: ইয়া আলী। বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম। ইয়া আলী
২য়: আজ মুহাম্মদ হায়াত আবদু কারিম মাসজিদে শরবেনা জো কা'বা মুকিম। অর্থ: আল্লাহর বান্দা মুহম্মদ হায়াত কর্তৃক কাবা সদৃশ এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।
৩য়: সাল তারিখ ফরহশ হাতেপ গুপ্ত জাহের বোজ যে 'নামে আজিম'। অর্থ: মহিমায় চেতনা গায়েবি আওয়াজে এর নির্মাণ তারিখ প্রকাশ করল সর্ববৃহৎ নাম হবে। (ছন্দবদ্ধ কবিতায় এর নির্মাণ তারিখ পাওয়া যায়: ১১০২ হিজরি (১৬৯০ খ্রি.)।

৬. শিলালিপি: বড় শরীফপুর মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের শীর্ষে স্থাপিত শিলালিপি: ফারসি ভাষা

. يا عليے بسم الله الرحمن الرحيم يا عليے
. از محمد حيات والاقدر شد بنا معبدى چو مت پام
. سال بشهم اين خحستہ بنا ہاتفم گفت مسجد اسحطنم

১ম: ইয়া আলী। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আলী। অর্থ: ইয়া আলী। বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম। ইয়া আলী।

২য়: আজ মুহাম্মদ হায়াত ওয়াল কাদির শাদ বেনা মা'বুদে জোমত ফাম। অর্থ: মুহম্মদ হায়াত পবিত্র এ মসজিদটি নির্মাণ করেছেন।
৩য়: সাল বেহাশিম আইনা খুহসেতাহ বেনা হাতেপাম গুপ্ত মাসজিদ আসহাতেনাম। অর্থ: এই মঙ্গলজনক স্থাপনার মেরামতের তারিখ গায়েবি আওয়াজে বলল সবচেয়ে বড় মসজিদ (ছন্দবদ্ধ কবিতায় এর নির্মাণ তারিখ পাওয়া যায়: ১১১৮ হিজরি (১৭০৬ খ্রি.)।

৭. এম.এ বারি, "বড় শরীফপুর মসজিদ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৩৮

৮. M. Abu Bakar, *Records of the Geological Survey of Bangladesh*, Vol.1, Part-2, Dacca, 1977, p.54

৯. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, বাংলাবাজার, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭), পৃ.-৬৭৬

১০. আয়শা বেগম, *প্রত্ননিদর্শন: কুমিল্লা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, সেপ্টেম্বর ২০১০), পৃ. ৯৬

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

১২. মাহ্‌মুদা খানম, *কুমিল্লায় মুঘল যুগের স্থাপত্য* (ঠাকুরগাঁও: আলপনা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি, ২০১২), পৃ. ৪৯

১৩. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka, 1961, p. 198

১৪. *Ibid*, p. 200

১৫. মাহ্‌মুদা খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

আলোকচিত্র

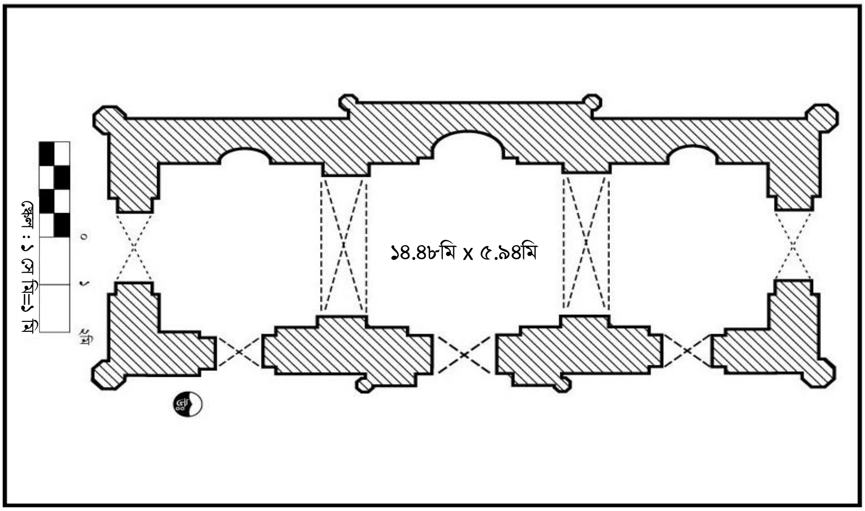
১৪.৪৮মি x ৫.৯৪মি
স্কেল : ১ সে মি=১ মি
০
১
মি

ভূমি পরিকল্পনা - ১

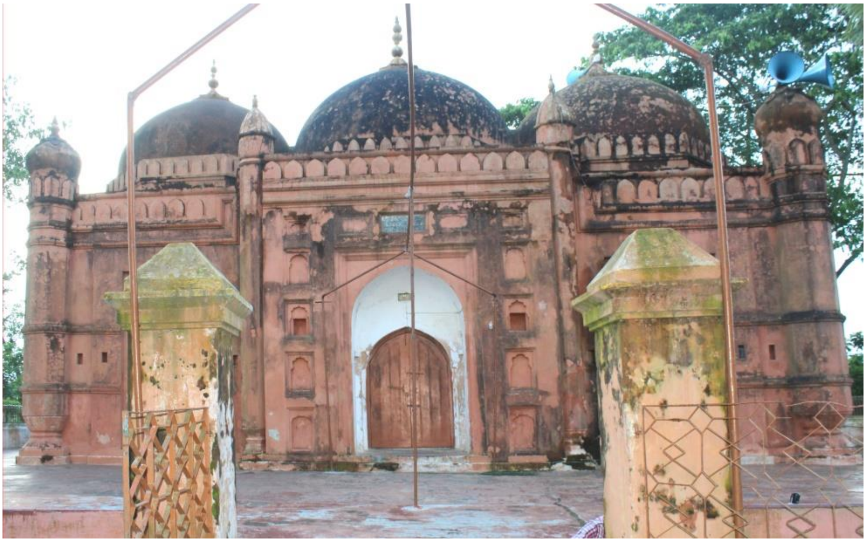

আলোকচিত্র ১: মসজিদের সম্মুখ দৃশ্য

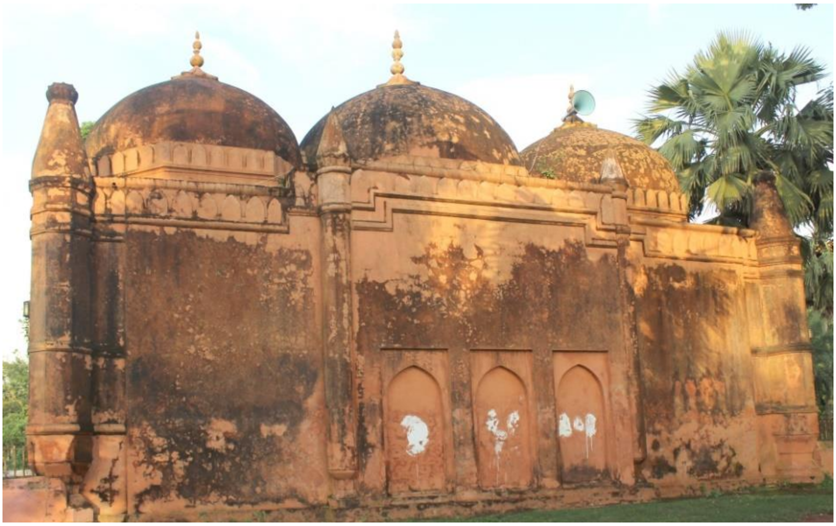

আলোকচিত্র ২: মসজিদের পেছনের দৃশ্য

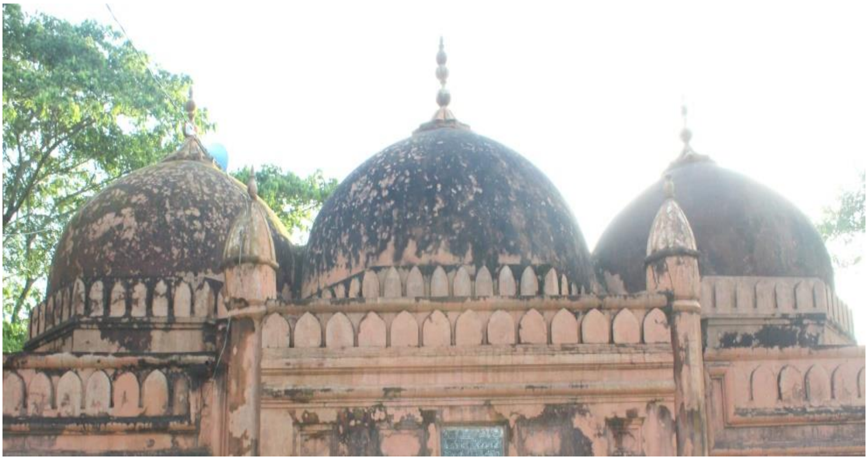

আলোকচিত্র ৩: গম্বুজ

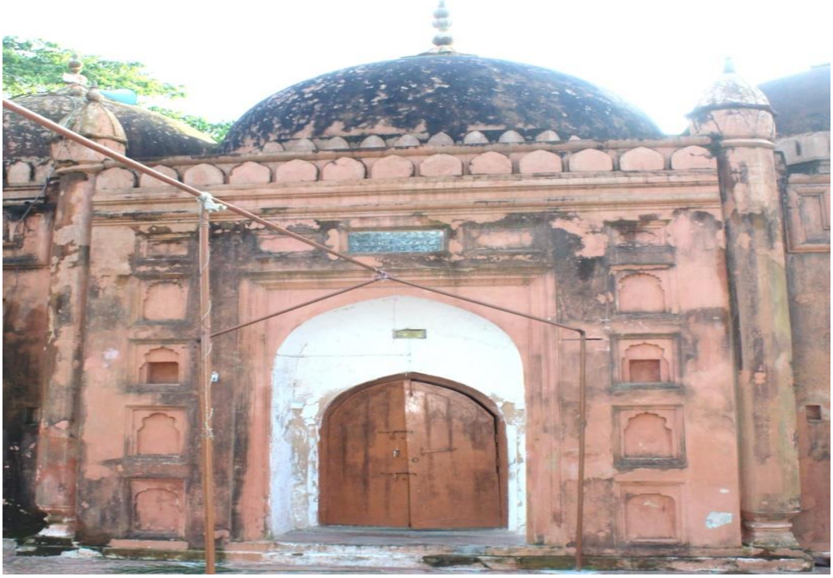

আলোকচিত্র ৪: কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ

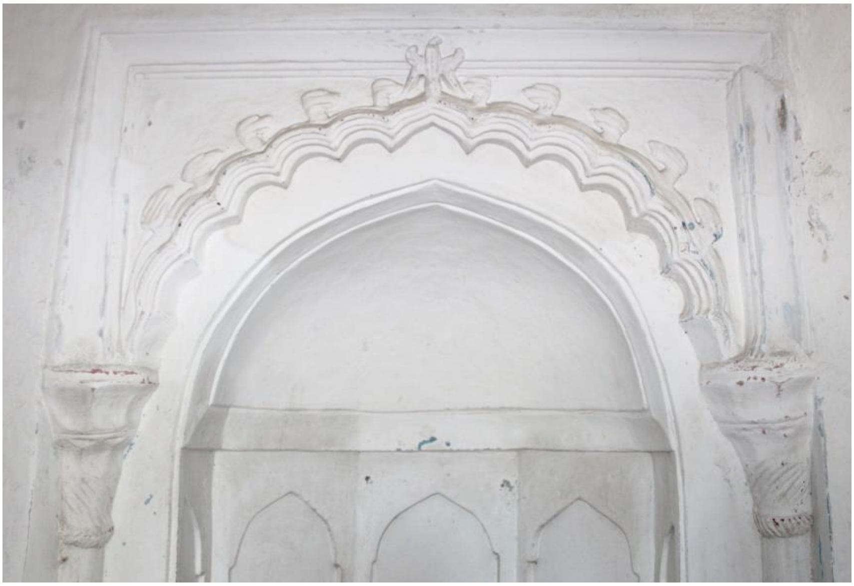

আলোকচিত্র ৫: পদ্ম-পাপড়ির মারলন নকশা

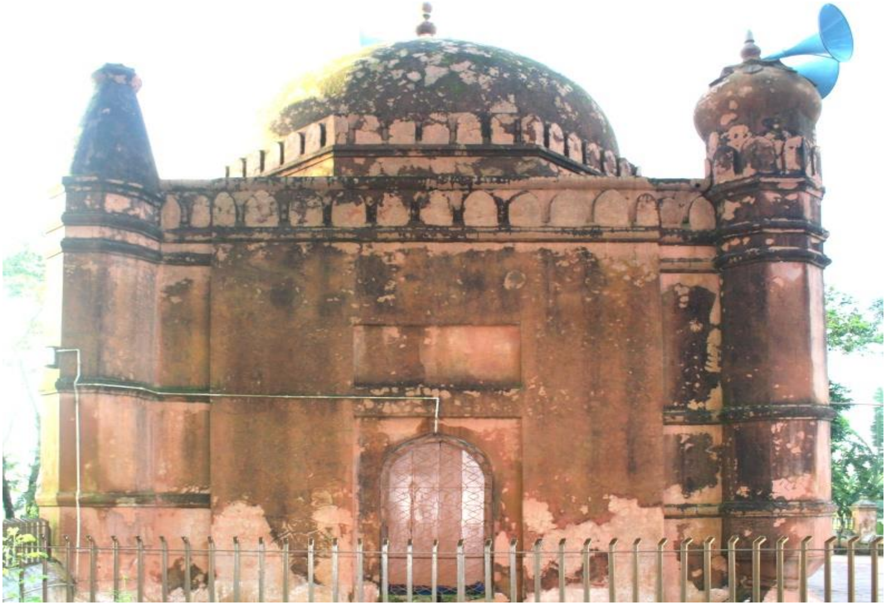

আলোকচিত্র ৬: অষ্টকোণাকার বুরুজ

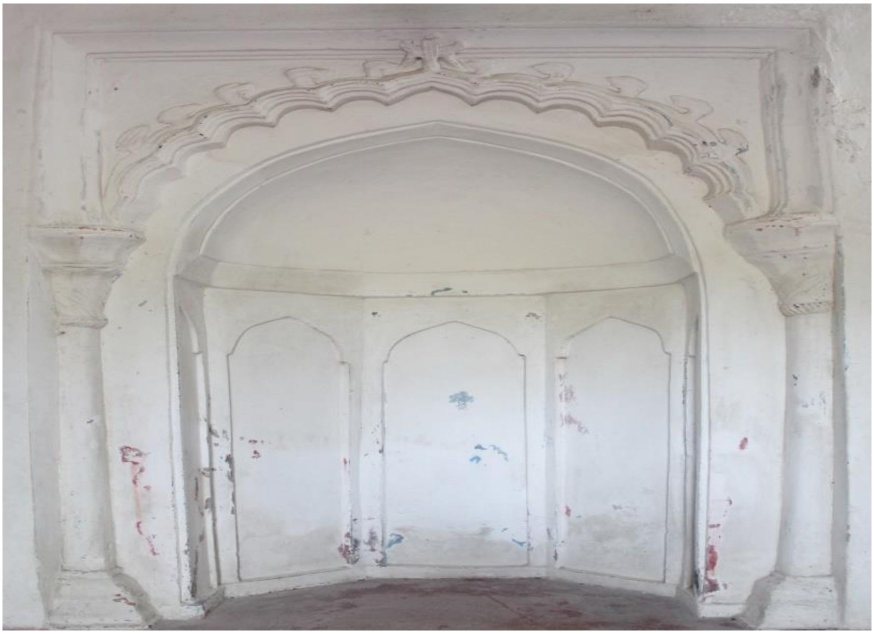

আলোকচিত্র ৭: কেন্দ্রীয় মিহরাব

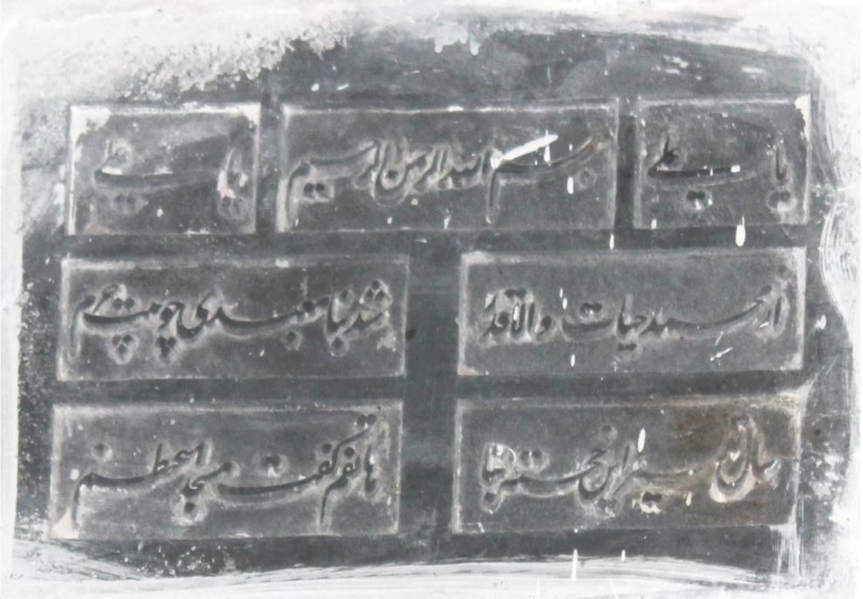

আলোকচিত্র ৮: ফারসি শিলালিপি

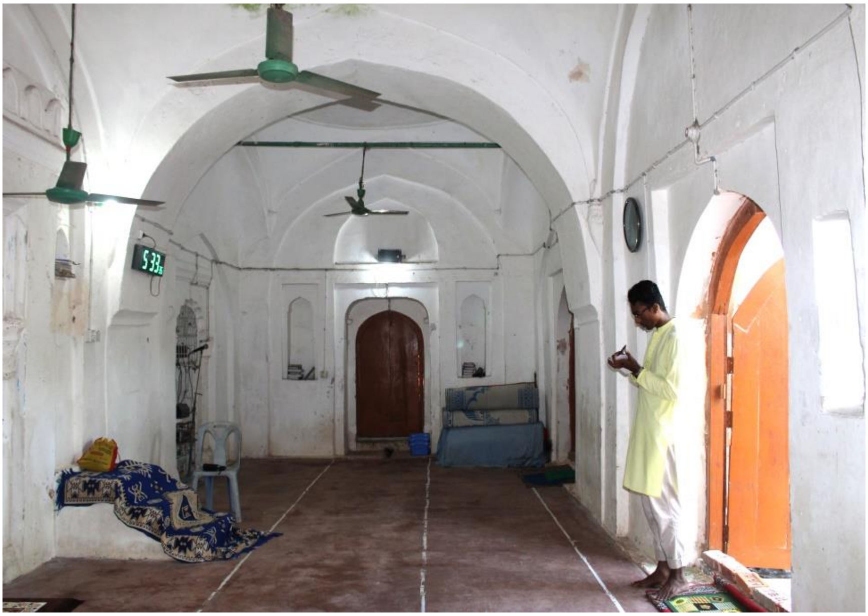

আলোকচিত্র ৯: নামাজগৃহ

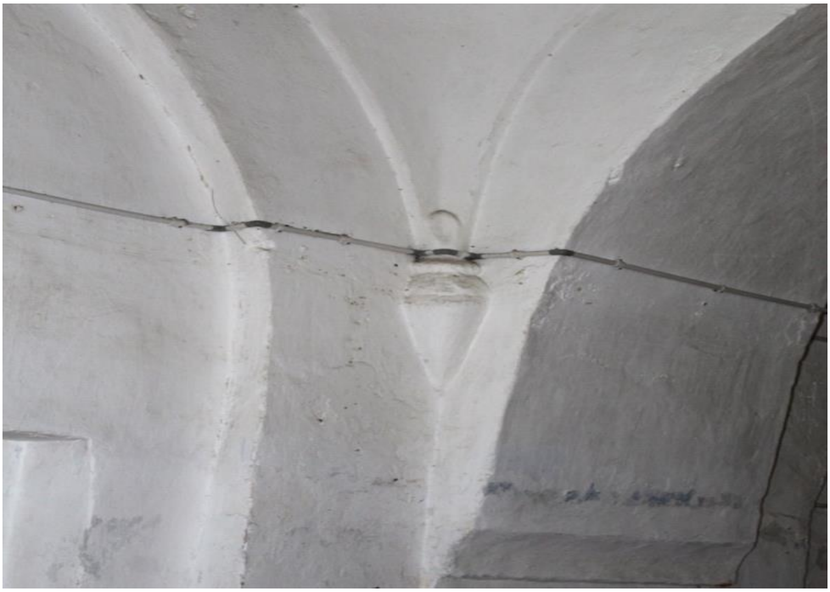

আলোকচিত্র ১০: ফুলের টব

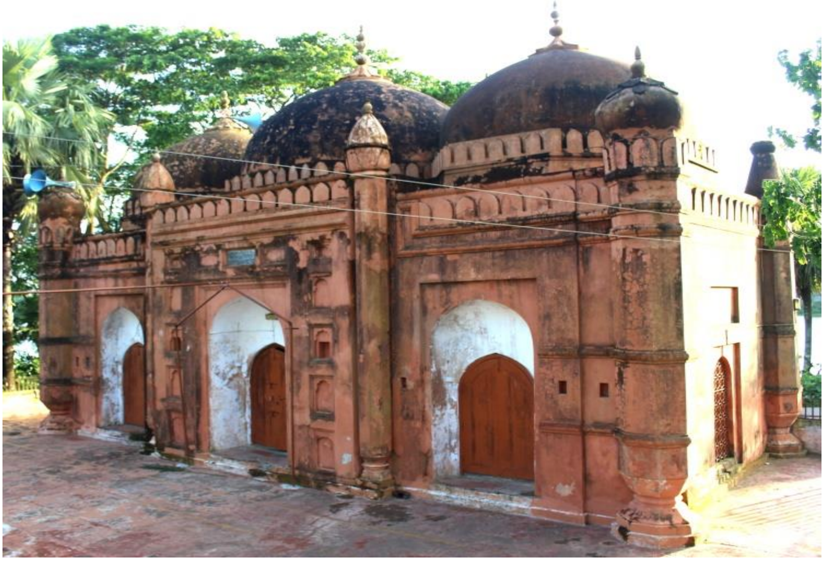

আলোকচিত্র ১১: বুরুজে বন্ধনী